ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 903-915
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.083

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্প: সমাজ ও জীবন-ভাবনা

মো : আবু বাকার সিদ্দীক, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মাধবদী মহাবিদ্যালয়, মাধবদী, নরসিংদী, বাংলাদেশ

Received: 18.03.2025; Send for Revised: 27.03.2025; Revised Received: 28.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Syed Waliullah (1922-1971) is one of the pioneers of modern art in short stories in Bangladesh. He emerged in Bengali literature in the 1940s. Syed Waliullah's first collection of stories is Nayanchara (1945). Nayanchara's stories can be divided into two main categories according to their subject matter and the depth of the author's imagination. The first category includes 'Nayanchara', 'Mrityu-Jatra', 'Rakta', and 'Sei Prithibha'. In the four stories mentioned above, Syed Waliullah has beautifully portrayed the 'pain, anguish, and sadness of the famine-stricken people' of his time. The stories marked in the second category are basically realistic stories of the lives of the people living close to the soil of river-rich East Bengal, their joyless and hopeful lives. The stories in this series are 'Jahazi', 'Parajoy', and 'Khuni'. In Nayanchara, he has brought talented people from the lowest strata of society and made them represent their own class. Syed Waliullah Nayanchara's subject matter is conscious of time and society and human responsibility, and his aesthetic creation is artistic and modern in its knowledge. Syed Waliullah's multidimensional life inquiry has been revealed in the book Duhi Tir O Anano Galpo (1965), published in the mid-sixties. The pain of rootlessness of people wandering against the backdrop of time and history has found an impeccable form in this book. The touching experience of the historical crisis caused by the partition, famine (1943), the journey of man and death, along with the isolation of the individual, are the themes of his story of Naishang Waliullah. However, anyone can understand through reading that the author is strongly aware of the times in Duhi Teer and Anano Galpo. Like a dispassionate seer, he has witnessed the cruel fate of history and realized the boundless calamity and humiliation of the people who are driven by fate. The Second World War (1939-1945), the terrible images of death, economic depression, dangerous times, and famine have emerged in Duhi Teer and Anano Galpo.

Keywords: *Nayanchara, Mrityu-Jatra, Rakta, and Sei Prithibha and life thought.*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলাদেশের ছোটগল্পে আধুনিক শিল্পদৃষ্টির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ১৯৪০-এর দশকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৫)। বিষয়-বিবেচনায় ও স্রষ্টার অনুভাবনার আততি অনুসারে 'নয়নচারা'-র গল্পগুলোকে মুখ্যত দুভাগে বিভাজন করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে পড়ে 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'রক্ত', ও 'সেই পৃথিবী'। উল্লিখিত

গল্পচতুষ্টয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর কালের 'দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষণ্ণতা'-কে রূপময় করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণিচিহ্নিত গল্পগুলো মূলত নদীবহুল পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের জীবন স্বরূপ, তাদের নিরানন্দ ও প্রত্যাশাদীপ্ত জীবনের বাস্তবভিত্তিক কাহিনি। এ শ্রেণির গল্পগুলি হচ্ছে 'জাহাজী', 'পরাজয়', ও 'খুনী'। 'নয়নচারা'-য় সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে প্রতিভূ মানুষদের এনে তাদের দিয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিয়েছেন স্ব-স্ব শ্রেণির। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'নয়নচারা'-র বিষয়বিবেচনায় সময় ও সমাজ-সচেতন ও মানবিক দায়িত্ববোধ-জাগরিত এবং রূপাঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রকলাপ্রিয়, আধুনিক মনস্তত্ত্বজ্ঞান-পরিস্রুত। ষাটের দশকের মধ্যপর্যায়ে প্রকাশিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বহুমাত্রিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে। দেশকাল ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচরণশীল মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা তাঁর এ গ্রন্থে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। দেশভাগজনিত ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা, দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), মন্বন্তর ও মৃত্যুযাত্রার পাশাপাশি ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, তাঁর নৈঃসঙ্গ ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পের প্রতিপাদ্য। তবে পাঠের মাধ্যমে যে কেউ বুঝতে পারবেন 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে লেখক প্রবলভাবে কালসচেতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মৃত্যু, অর্থনৈতিক মন্দা, বিপন্ন সময় এবং দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র দুই তীর ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থে উঠে এসেছে। নিরাসক্ত দ্রষ্টার মতো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের নিষ্ঠুর নিয়তি এবং উপলব্ধি করেছেন ভাগ্যতাড়িত মানুষের সীমাহীন বিপর্যয় ও লাঞ্ছনা যা প্রবন্ধটির মূল আলোচ্য।

সমাজ ও জীবন ভাবনার স্বরূপ ও প্রকৃতি:

ছোটগল্পে সমাজ ও জীবন দুটোরই আধিপত্য থাকে। সমাজ ও জীবন প্রকৃতপক্ষে পরস্পরেরই পরিপূরক দুটি বিষয়। সমাজ-জীবনে সংঘটিত অনাচার, ব্যভিচার ও কুৎসিত কুটিল প্রকৃতি সমাজ-জীবনের সুস্থ প্রবাহ বিঘ্নিত করে। শিল্পী তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে সমাজ ও জীবনের বাস্তব চিত্র অংকন করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর গল্পে স্বকাল ও সমাজবাস্তবতাকে ধারণ করেছেন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পী হিসেবে:

> "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ স্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্যোগময় ঘটনা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। বাংলায় ১৮৯৯, ১৯১৮ ও ১৯২৮ সালে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ এবং দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত অঞ্চলের আয়তন ও পূর্বাপেক্ষ ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিশাপ ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলায় ১৫ লক্ষ মানুষ চরম দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়।"[১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথমদিকের গল্পগুলোর পটভূমি ছিল সমাজের বিস্তৃত প্রান্তর কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে যাত্রা করেন ব্যক্তি-মানুষের অন্তরের কন্দরে। একে আমরা বড় থেকে ছোটতে প্রত্যাবর্তন বলব না, এ হ'লো সীমা থেকে সীমাহীনতার দিকে ধাবিত হওয়া। কোনো সৎ ও সচেতন শিল্পীর পক্ষে দ্বিতীয় মহাসমর, মন্বন্তর এবং এ কালের সৃষ্ট সমাজ-সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পও এক্ষেত্রে বিশেষ মনসংযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে:

> "সেদিন (১৯৪৩-৪৭) কোনো লেখকই পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন নি। থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ অধিক সচেতন, কেউ অল্প সচেতন। বারুদের গন্ধ সবাই পাননি, কামানের গর্জন সবাই শোনেন নি, কিন্তু সব লেখকই উদভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন, দূরে দেখেছেন বহ্নিবলয়বেষ্টিত দিগন্ত।"[২]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সময় ও দুঃসময়ের দাবি মেনে নিয়েই পালন করেছেন তাঁর সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। ওয়ালীউল্লাহের গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি-আদর্শের সর্বাত্মক

ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব-পঙ্কিলতার কোনো মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। তাঁর 'নয়নচারা' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'নয়নচারা'। 'নয়নচারা'গল্পটি তাঁর সুস্থিরও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের ব্যক্তি-চেতনাপ্রবাহ-আশ্রিত, অনুভূতিমগ্ন রূপেরই শিল্পকথা। 'নয়নচারা' গ্রন্থে ওয়ালীউল্লাহ্ সমানভাবে কাল ও সমাজ সচেতন:

> "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটোগাল্পিক শিল্পীসত্তা নয়নচারা-য় পৌঁছে একটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। এ পর্বে তিনি সমকালীন সমাজও রাষ্ট্র-মানসের ঘটনাবর্তে আলোড়িত হয়েছেন এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়নে হয়েছেন আন্তরিক। নয়নচারা-য় সংকলিত গল্পমালা সে-অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের চেতনাস্রোত, অনুভূতি, অন্তঃকরণ এবং কাল ও সমাজ- সচেতন মনস্ক্রিয়ার অনুভূতি ও শিল্প-অভিজ্ঞান।"[৩]

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজার হলে খাদ্যের সন্ধানে আগত মানুষের মিছিলে কলকাতা শহরে আসে আমু। সে একা নয়। তারই মতো আরো অনেকেই আছে তার সঙ্গে। তারা মরে যাচ্ছে কেউ কেউ। যেমন মরে ভুতনির ভাই ভুতো। এই মৃত্যুলোকের মধ্যেই ময়রার দোকানে থরে থরে মিষ্টি সাজানো। সেখান থেকে আমু তাড়া খায়। আর-একবার হোটেলের সামনে সে যখন দৃপ্ত প্রতিবাদী, সেখান থেকেও তাকে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসতে হয়। আমুর ক্ষুধাতাড়িত অবসন্ন দেহ একমুঠো ভাতের আশায় যখন শহরের অলিগলিতে ঘুরছে, তখন একটি বাড়ির দরোজা খুলে এক অচেনা মেয়ে তাকে ভাত দিলে আমুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা, 'নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?' কারণ আমু এখন অদ্ভুত শহরের অধিবাসী যেখানে,'শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। এখানে মানুষের চোখে এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।' শহরে মানুষের অভাব নেই, 'অভাব শুধু মনুষ্যত্বের।' বস্তুত, 'নয়নচারা'য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমুর ক্ষুৎপীড়িত অন্তরের কথকতা নির্মাণের মাধ্যমেই তাঁর কালের সমাজ ও মানুষের সঙ্গে হয়েছেন সহমর্মী, অভিন্নহৃদয়।'[৪] 'নয়নচারা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ এমনি এমনি প্রাকৃতিকভাবে আসেনি, এসেছে মুনাফাখোর, অপরাজনীতিবিদদের কারণে। দুর্ভিক্ষের করাল মুহূর্তেও সামাজিক শ্রেণিভেদ লোপ পায় না। দুর্ভিক্ষের তোড়ে আমুর মতো দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষেরাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে। 'ক্ষুধার পৃথিবীতে ফেলে আসা গাঁয়ের স্মৃতিদীর্ণ আমুর মনোভঙ্গির স্বরূপ উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন লেখক।'[৫] 'নয়নচারা' তাই আমু-ভুতনি-ভুতোর ক্ষুধাদীর্ণ মনের কথা; তাদেরই শহরাভিজ্ঞতার এক রুধিরাক্ত রূপকল্প।

'জাহাজী' নিঃসঙ্গ সারেং জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্রকল্প। করিম সারেং আত্মীয়-সংসর্গবিহীন। জাহাজী জীবনে তার মন বিচিত্র ভাবনার রাজ্যে সংশ্লিষ্ট হয়। করিম সারেং কখনো শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে, কখনো বিনম্রচিত্রে প্রার্থনা-নিরত হয় রাহমানুর রহিমের প্রতি। জীবনের অন্তসারশূন্যতায় বিদীর্ণ হয়ে এক ধরনের অভিযোগসহ কখনো অসীমের উদ্দেশ্যে এক অপ্রতিরোধ্য জিজ্ঞাসার তাড়নায় উদ্বেলিত হয় তার মন: 'তুমি কী দিলে আমাকে আর আমি কী দিলাম তোমাকে।' কিন্তু তার উত্তর কখনো সে পায় না। এই রূঢ় বাস্তবতার সংঘর্ষে ধ্যাননিমগ্ন মনটি তার আকস্মিকভাবে কখনো কখনো রুক্ষতায় প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে ওঠে। চীফ অফিসারের লাথি খেয়ে সাত্তার যখন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে তখন স্বভাবের তাড়নায় নির্মম হয়ে ওঠে, সে মুহূর্তে তার দুচোখ যেন আগুন ঝলসে ওঠে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সাত্তারকে বলে-'যা, আই দেইক্যুম।'

করিম জাহাজীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই, জন্মভূমিও তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে, এই আত্মীয়বিহীন নির্বান্ধব জীবন কখনো কখনো তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এক মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার কাছে এখন মনে হয়- 'অতিক্রান্ত দীর্ঘ জাহাজী জীবন শূন্য কলসের মতো শুধু ঠনঠন করছে।' বিগত জীবনের অনুশোচনায় সে ব্যথিত ও অনুতপ্ত। বৃদ্ধ করিম সারেংকে মা, মাটি বার বার কাঁদায় কেন? তার কারণ সম্ভবত সেখানে 'মাটি আছে, আর মানুষ আছে।' তাঁর জীবন বন্ধনহীন; কিন্তু সাত্তার তো বাপ-মা-ভাই-বোনের স্নেহ-

ভালোবাসায় বন্দী-তাই করিম সারেং তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়। আর সে ভেবেছিল 'এবার শেষ হবে তার সামুদ্রিক জীবন, এবার এ-অশান্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে', সেই করিম জাহাজ বন্দরে ভিড়তে-না-ভিড়তে সিদ্ধান্ত নেয়: আবার সে জাহাজে চুক্তি নেবে এবং যদি পারে আমৃত্যু সমুদ্রেই বাস করবে। তার কারণ হলো:

> "যে-ছাত্তারকে সে প্রায় পিতৃস্নেহে জাহাজী জীবন থেকে মুক্তি দিল, সে ফিরে ও তাকাল না জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময়। এই স্বজনহীনতা, নিঃসঙ্গতা, 'প্রশ্নের কাঁটার মধ্যেই তো মানুষের জীবনের অবসান ঘটে', বৃদ্ধ করিম সারেঙের জীবনে এই দার্শনিক বোধ বিস্তীর্ণ হয়। করিম সারেঙের অক্ষিত প্রবহমান জাহাজী জীবনে আবার ভেসে যাওয়ার মধ্যে এক অমোঘ নিয়তি কাজ করে যায়-যে-নিয়তিচেতনা ওয়ালীউল্লাহ্ বহু রচনার এক নির্দেশক।"[৬]

'পরাজয়' ও 'খুনী' গল্প দুটি পূর্ববাংলার নদী তীরে জেগে-ওঠা চরতাড়িত ও চরপীড়িত জীবনের নির্মম ভাষ্য, নিরাবেগ কাহিনি। নদী-চরের জীবন অনিশ্চিত। এজীবন প্রকৃতির কাছে অসহায়, নিরুপায়ভাবে পরাজিত। কিন্তু বিপত্তি, পৌনঃপুনিক বিপর্যয় ও পরাভব সত্তে ও তাদের সংগ্রাম থামে না। নব আশা ও চেতনায় দীপ্ত ও প্রাণিত হয়ে জীবন আবার সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবেই নতুন চরে মাচা বেঁধেছিল ছমির ও কুলসুম। কিন্তু তাদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা সফল হয়নি। মাচায় ওঠার অনতিকাল পরেই সর্পদষ্ট হয়ে ছমির মারা যায়। তখন মধ্য রাত। নিকটবর্তী মাচার আলো দেখা গেলেও দুই মাচার ব্যবধান বিস্তর। তাই রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে কুলসুমের অনুচ্চ কণ্ঠের ডাক কেবল শূন্যেই মিলিয়ে গেছে, কুলসুমের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরের দিন মজনু ও কালু এসে ছমিরের মৃতদেহ নিয়ে গেছে, সঙ্গে সদ্য বিধবা কুলসুমকেও। চরের জীবন এমনই শ্বাপদসংকুল, মৃত্যু ও মড়কের মধ্য দিয়ে বহমান। ছমির-কুলসুম তাই কোনো বিচ্ছিন্ন দম্পত্তি নয়, চরবাসী মানুষদেরই তারা প্রতিভূ, বিশেষে নির্বিশেষ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন তাঁর নিজের সমাজ ও মানুষদের জীবনাশ্রিত সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন তেমনি তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্যানুরক্তিতে মুক্তি খুঁজলে চিত্রল পতঙ্গের মতই আহূতি দিতে হবে। তাই উত্তরাধিকারে সমর্পিত ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি আত্মমুক্তি অন্বেষণ করেছেন। ফলে তাঁর চরাঞ্চল আশ্রিত গল্পগুলোতে সেই বিশেষ অঞ্চল, নির্দিষ্ট এলাকার নির্বিশেষ মানুষের জীবন সংগ্রামই মুখ্য, ব্যক্তি সেখানে সমষ্টিরই প্রতিনিধি, প্রতীক ও প্রতিভূ।

'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন আখ্যান। যেখানে নির্দিষ্টকোনো চরিত্র মুখ্য নয় বরং তিনু, করিম, কমলি, আসগর, ময়না, হাজুর বাপও মা, আনু, হালুর মা, রব্বি মিঞার বউ, তোতা প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে গোটা সমাজকে তোলে ধরেছেন। 'নয়নচারা'র মতো 'মৃত্যু-যাত্রা'ও ধারণ করে রেখেছে ১৩৫০-এর মন্বন্তরকে: দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে এ দুটি প্রতিভূ-গল্প। 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পে দুর্ভিক্ষ রূপ লাভ করেছে 'নয়নচারা' থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়, ব্যাপক মানুষের বাস্তব ও ক্ষুধা-উৎসারিত চৈতন্যের একান্তবর্তী হয়ে। গ্রামে খাদ্য নেই। দীর্ঘ অনাহারে নির্জীব কঙ্কালসার মানুষগুলো তাই গঞ্জে চলেছে। কিন্তু সে পথ অনেক দূরের। এ অভিযান বন্ধুর, প্রতীক্ষার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। অভিষ্ট লক্ষে তাই অনেকেই পৌঁছতে পারেনি। পথেই অনেক অনাহারী-জীবন অকালে ঝরে গেছে। বস্তুত, 'মৃত্যু-যাত্রা' সেই সব মানুষের ব্যর্থ যাত্রার কাহিনি যারা ক্ষুধায় কাতর, শীর্ণ, অস্থিচর্মসার, অথচ পরমভাবে তারা আকাঙ্ক্ষা করছে বাঁচার, সামান্যতম আশ্রয়ের, ক্ষুধার খাদ্যের। এক কথায় 'বাংলাদেশের অনাহারক্লিষ্ট জীবনমৃত মানুষ যেন মিছিল করে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছে।'[৭]

গাঁয়ে বিভৎস আকাল দেখা দেয়ায় হালু, রবিব মিঞার বউ; দুটো ছেলে এবং সারা গাঁয়ে বহু লোক মারা গেল। তাই তারা ওপারে যাবে বলে ঘর থেকে বের হয়েছে: 'তা ওপারে বড় গাঁ, চাল পাওয়া যাবে নেশ্চয়।'[৮] কিন্তু তাদের এ মৃত্যু-যাত্রায়ও বাধাঁ আছে। সে বাধা হাজুর অতিবৃদ্ধ বাপ-মা। হাজুর বৃদ্ধ মা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে নদীর ঘাটে। দলের লোক মারা গেল, তাকে সৎকার না করে কী করে তারা যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু তাদের আছে ক্ষুধার জ্বালা, সেই সঙ্গে নেই কোনো সহায় সম্বল। এমন সময় ঘাটে আরো একটি মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুতে সবাই বিরক্ত হয়। কারণ প্রথম মৃত্যুতে তাদের মানবিকতা জাগ্রত হলেও দ্বিতীয় মৃত্যুতে তাদের ক্ষুধার জ্বালায় মানবিকতা আর জাগে না। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাজুর বাবার লাশ ফেলে এক মুঠো খাবারের জন্য চৌধুরী বাড়ির দিকে রওনা হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ গল্পে মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে বড় করে দেখেছেন। কারণ জীবনই যদি না থাকে মৃত্যুবরণ করবে কী। জীবন আছে বলেই তো মৃত্যু। মৃত্যু স্থবির পড়ে থাকে নদীর ঘাটে; জীবন নিজকে বাঁচাতে চৌধুরী বাড়ির দিকে খাবারের জন্য রওয়ানা দেয়। কারণ মৃত্যুর চেয়ে জীবনই শক্তিশালী।

'খুনী' গল্পে খুনী রাজ্জাকের প্রতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গভীর ভাবাবেগ ব্যক্ত হয়েছে। একজন খুনীও যে জীবনকে ভালোবাসে এবং জীবনকে ভালোবেসে বাঁচতে চায় তার শিল্পসম্মত প্রকাশ 'খুনী' গল্প। মূহুর্তের ঝোঁকে চৈত্র মাসে ফজু মিয়াদের বাড়ির ফইন্যার মাথা ফাটিয়ে দেয় চর আলেকজান্দ্রার সোনাভাঙ্গা গ্রামের রাজ্জাক। সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে না, যদিও স্বাভাবিক জীবনের জন্য তার তৃষ্ণা দুর্মর। বিবাহ করে গৃহী জীবনযাপনের স্বপ্নে আবেদ দর্জির বিধবা পুত্রবধূ জরিনাকে ভালোবেসেও রাজ্জাক দর্জির কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে ইতস্তত করে। কিন্তু যখনই রাজ্জাক সেই প্রস্তুতি নেয়, তখনই আকস্মিকভাবে দীর্ঘ দিন পরে ফিরে আসে দর্জির নিরুদ্দেশ পুত্র মোমেন। তখন রাজ্জাকের 'অন্তর্ময় ঝলকে উঠল তীক্ষ্ণ বেদনা।' মুহূর্তে সে বুঝে নেয় সুস্থ স্বাভাবিক গৃহী জীবনে সে ফিরে যেতে পারবে না। গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য না থাকলেও মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ-প্রয়াস যথারীতি রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকেই জীবনের সত্য আশ্চর্যভাবে বেরিয়ে আসে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সব মানুষের মনের অন্তর্মুখী ভাবনা-কামনা কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সর্বোপরি জ্বালা-যন্ত্রণাগুলোকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনন্য শিল্পকৌশলে বিকাশ লাভের অবকাশ দিয়েছেন তাঁর মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ এই ধারার গল্পগুলোতে: 'আধুনিক শিল্পের এক কুললক্ষণ: সমাজের অজ্ঞাত, খ্যাত, অবহেলিত, ঘৃণিত ও পরিত্যক্তদের জন্যে সহানুভূতি ও মমত্ব, তাদের সমস্যাকে মানবিক চোখে দেখা।'[৯] খুনী রাজ্জাকের মনের অপরাধবোধকে ওয়ালীউল্লাহ্ অন্তবর্তী চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন: 'শেষে একটি কথা ভেবে শান্তিতে তার কান্না শান্ত হল। যে লোক খুন হয়, সে বেহেশতে যায়। ফইন্যা বেহেশতে যাবে। খোদা কখনো তাকে ক্ষমা না করুক, কিন্তু ফইন্যার বেহেশত-লাভের কথা তাকে চিরদিন শান্তি দেবে।'[১০]

'খণ্ডচাঁদের বক্রতায়' ঢাকার এককালের বস্তিবাসীদের জীবনের কাহিনি বেশ কৌতূহল ও কৌতুকের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শেখ জব্বার পাড়ার একজন ধনী লোক। তাঁর দুটি গাড়ি, দুটি ঘোড়া আর অন্দরমহল ভর্তি চাকর-বাকর এবং চারজন বিবি রয়েছে। তিনি সেখানে ঘোড়েকা বাদশা নামেও পরিচিত। সেই পাড়ার সব অধিবাসীরা গাড়োয়ান। সারা বস্তি জুড়ে সেদিন বেজায় ধুমধাম চলেছে: 'এ বস্তিতে আজ এই যে এত আনন্দ ও কোলাহল, এর মূলে রয়েছে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন।'[১১] জব্বার মিয়া আজ ছোট বিবিকে ঘরে তোলবেন। সে উপলক্ষে জীর্ণ গ্রামোফোনে কোনো এক অখ্যাত বাইজীর খ্যামটা নাচের গান চলছে। এক ছোকরা কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাতে ওড়না টেনে ঘুরে ঘুরে নেচে সবাইকে মাৎ করছে। এমনকি শেখ জব্বার মিয়াও রসে টগমগ হয়ে মন্তব্য করেন: 'ওয়াহওয়া, কেয়া নাচনা। এই ভাই কামাল, এইসা নাচ দেখা কভি?'[১২] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্পটিতে বস্তিবাসীদের উল্লাস, শেখ জব্বারের চার বিবির

পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, হতাশা, মারামারির মধ্য দিয়ে বস্তিবাসীদের বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন ফুটিয়ে তোলেছেন। ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে নগরের উপান্তে পল্লবিত জীবনের এক বাস্তব চিত্র যা শেখ জব্বারের হয়েও নির্বিশেষ বস্তি মালিকের, সেই সব স্ত্রীর যারা নিরুপায় হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে বহু-বিবাহের নিষ্ঠুর গিলোটিনে। শেখ জব্বার নিজের আনন্দ-অগ্নির উত্তাপ সকলের মধ্যে সংক্রমিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে জব্বারের অন্দরে তার প্রাক্তন তিন স্ত্রী তাদের অবস্থান পরখ করছে নতুন বিবির সঙ্গে। মেয়েদের শক্তি পরীক্ষার এ পরিবেশ স্থূল, লঘু, হাতাহাতি ও চুলোচুলিতে সংঘাতময়, উচ্চকণ্ঠ বাক্যালাপে মুখর হলেও বাস্তব, সমাজ-সত্যেরই স্মারক।

'সেই পৃথিবী' গল্পে পাপবোধ সাদেককে বারবার দংশন করছে। চুরি করতে গিয়ে একবার একটি বিশেষ দৃশ্য তার মনে গাঁথা হয়ে যায়। দেয়ালের ফুটো দিয়ে সে দেখেছিল একটি ঘুমন্ত মেয়ে: ঘুমন্ত মেয়েটির মাধুর্য যে তাকে আকৃষ্ট করছিল তা নয়; যে-জন্যে সে ফুটো থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না-সেটি হল মেয়েটির একটি স্তন। একটু আগেও হয়তো শিশুকে মাই দিয়েছিল, এখনো সেটি অনাবৃত।[১৩] সাদেকের পেশা হচ্ছে চুরি করা কিন্তু তার একটা কোমল অন্তর আছে যার কারণে সে অপরাধ জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সাদেক একদিন চাকরিও পেয়ে যায়-ফলে সে চুরি ছেড়ে দেয়। সে তার প্রাক্তন চোর-গুণ্ডা-বদমাশ বন্ধুদের মাস-মাইনের সব টাকাই দিয়ে দেয়। সাদেক হৃদয়হীনতার অপবাদ দূর করতে বদ্ধপরিকর। তাই সে 'প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েও কোথায় একটি পৃথক সত্তা বোধ করতে থাকে। তা আর-কিছু নয়-সংসার জীবনের সাধ।'[১৪] 'পৃথিবীর মধ্যেও যেন কোথায় আবার রূপকথার দেশ...' সেই পৃথিবীর জন্যেই তার তৃষ্ণা। 'যে-পৃথিবী ভরা সূর্যালোক-ও মুক্তি, যে-পৃথিবীতে শিশুরা কাঁদে ও দম্পতিরা হাসে, যে-পৃথিবীময় শুধু টলমল স্নেহ, সে-পৃথিবীই বেহেশত?' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০-এর মন্বন্তর, অপরদিকে অপরাজনীতি, শাসন- শোষণ প্রত্যক্ষ করে এ গল্পটিতে একটি শান্তিময় পৃথিবীর প্রত্যাশা করেছেন। যেখানে থাকবে শুধু 'ঘরময় অসম্ভব শান্তি।'

'দুই তীর' গল্পে আফসার উদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য-সমস্যাকে প্রধানত জীবনের দুই তীর থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়: 'প্রবাহিত নদীর দুটি তীরের মতোই মিলনহীন দুই নর-নারীর দাম্পত্য কথকতা এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। এরা দু'জন আফসার উদ্দিন ও হাসিনা, আমাদের এই শ্রেণিভূক্ত সমাজের উঁচু-নিচু দু'টি শ্রেণির বলিষ্ঠ প্রতিভূ।'[১৫] আফসার উদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলী পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত খানদানী বংশের সন্তান এবং শ্বাশুড়ি মরিয়ম খানমও উচ্চ বংশীয়। কিন্তু আরশাদ আলী পারিবারিকভাবে সুখী হতে পারেননি। অপরদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অথচ উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বড় চাকুরে আফসারউদ্দিন ধনী পিতার কন্যা হাসিনার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। আফসার উদ্দিনের ছোট বংশ পরিচয় হাসিনার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, কারণ, বিশেষ করে নিজের বংশ-গৌরব সম্পর্কে সে অতি সচেতন। এতে করে তাদের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে উঠে যায় এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং শয্যা সঙ্গী হয়েও পরস্পরের কাছে থেকে যায় অপ্রকাশ্য, অনাত্মীয় ও দুর্বোধ্য, যার সমাপ্তি বিচ্ছেদে।

আফসারউদ্দিন দারিদ্র্য-জর্জরিত পরিবার থেকে উঠে এসেছে। যে জীবন সে ফেলে এসেছে, সে জীবনের প্রতি তার কোন মমতা নেই। কারণ দারিদ্র্য ছাড়া সে জীবন আফসারউদ্দিনকে মোহনীয় আদরণীয় কিছুই দিতে পারেনি। তবু বিগত জীবনকে তার ঘনিষ্ঠ মনে হয়। লেখক বলেন: 'হয়তো সে-জন্যই দু-বছরব্যাপী প্রচেষ্টার পরেও রস তার নতুন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই। তার আবরণই কেবল গ্রহণ করেছে, তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি।'[১৬]

আফসারউদ্দিনের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের অবসান হয়েছে সত্য, কিন্তু তার ভিতরে অস্ফুট ভয়-শঙ্কা কাজ করছে কারণ আফসারউদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে-পুল, সে-পুলের মধ্যখানে হাত

বাড়িয়ে পথরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী হাসিনা। হাসিনার এই দুর্বিনীত স্বভাব স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে না। কারণ তার শরীর সুস্থ। সে লাবণ্যময়ী। স্বামীকে সহ্য না করার কারণটা অন্যস্থলে এ বৈকল্য, অস্বাভাবিকতা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গল্পে আরশাদ আলী ও আফসারউদ্দিন দুজনেই নিয়তির হাতের পুতুল:

> "আরশাদ আলী ও আফসারউদ্দিন দুজনেই প্রীতিহীন দাম্পত্য-জীবনের শিকার। সেখানে আলোর বিচ্ছুরণ নেই, আছে শুধু নিবিড় তমিস্রা, নারী সেখানে নিষ্ঠুরতার প্রতীক, পুরুষ অদৃশ্য নিয়তির ক্রিড়ানক মাত্র। সংসারের রীতিমাফিক নিয়মে দেখা যায় সাধারণত নারীই সযত্নে তার সংসারটি গড়ে তোলে। সেখানে নারীধর্মের স্বাভাবিক পরিণতির বিকাশ ভালোবাসা। কিন্তু 'দুই তীরে' তার বিপরীত রূপটিই দেখা গেল। আরশাদ আলীর সংসারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে নারী, আফসারউদ্দিনের জীবনকে ধ্বংস করে নারী।"[১৭]

আফসারউদ্দিনের বিশ্বাস ছিল বিয়ের পরে অপরিচিত নরনারীর মধ্যে ভালোবাসা সঞ্চার না হওয়াটা প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তার এ বিশ্বাস এখন ভেঙ্গে গেছে। তার এখন মনে হচ্ছে দাম্পত্য জীবন একটি প্রহসন মাত্র। 'দুই তীর' গল্পের নিষ্প্রাণতা ও নিষ্প্রেমের কাহিনি যেন কোনো ব্যক্তির জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হওয়া জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আর আফসারউদ্দিন তা দেখতে পান শ্বশুরের না দেখা জীবনে। আফসারউদ্দিন অনুভব করেন তাদের অসঙ্গত সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ ফারাক 'দুই তীর' যেন হাসিনা ও আফসারউদ্দিনের অনুরাগহীন, মরুকল্প হৃদয়ের দুই মেরুবিন্দু: 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের নাম গল্পটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শেণির ভিতর বাড়িতে; সেখানকার আপাত উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা, বঞ্চনা, দীনতা, নিষ্প্রেম-তারই চিত্রাঙ্কন করেছেন তিনি।'[১৮]

শিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যদিও বিদ্রোহের নন, কিন্তু স্বসমাজকে নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন তিনি, তাই সমাজের সকল প্রকার অন্যায়, অন্ধতায় তিনি আহত হয়েছেন এবং সে-সবের বিরুদ্ধে মৃদু-প্রতিবাদ ও বিদ্রুপ উচ্চারিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। ওয়ালীউল্লাহের সমাজ সচেতনতার দীপ্ত সাক্ষর 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নয়া-সড়ক' নামক সাহিত্যপত্রে গল্পটি বেরোয় ১৯৪৮ সালে, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির (১৯৪৭) করুণ পটভূমিতে এটি একটি প্রতিনিধি-গল্প।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্পে প্রতীক দেশ-কাল ও মানবজীবনের ব্যাপকতর পটভূমিকায় বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক ও রাজনেতিক বিপর্যয় এবং ব্যক্তি-সমাজ ও পরিবার জীবনের ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার অনুষঙ্গে দুই তীরও অন্যান্য গল্পগ্রন্থে প্রতীক স্বতন্ত্র্য মাত্রা লাভ করেছে। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহপ্রতীক-ফর্মে বিন্যাস করেছেন মানবিক মহত্ত্বের দীপ্তিকে। দেশবিভাগের উত্তেজনায় কলকাতা থেকে আসা কয়েকজন মুসলিম যুবক দখল করে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। এত বড় বাড়িতে তারা কখনো থাকেনি। নিশ্চিত আশ্রয় লাভের উল্লাসে যখন তারা আত্মতৃপ্ত, এমনি সময়ে অকস্মাৎ মোদাব্বের আবিষ্কার করে তুলসীগাছটি। তুলসীগাছটির প্রতি প্রথমে তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ক্রমে হিন্দু গৃহকর্ত্রীর কাছে তুলসীগাছের যে-মর্যাদা ও পবিত্রতা তা'যেন ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই সঞ্চালিত হয়ে যায় ফলে 'অক্ষত দেহে বিরাজ করতে থাকে তুলসীগাছটি।' কিন্তু বাড়ি দখলকারীদের আশ্রয়-সুখ অল্পদিনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করে, ফলে তাদের ঐ বাড়িটি ত্যাগ করতে হয়: বস্তুত, 'পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রিত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন বলেই ভীত, একদা আশ্রয় পেয়েও বিতাড়িত। সাম্প্রদায়িক

সংকট, দুই বাংলার মানুষদের বাস্তুভিটা ত্যাগের কারণেই তাদের এই বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর পরস্পরকে অনাত্মীয় ও শত্রুজ্ঞান।[১৯]

অতঃপর দেখা যায়, উঠানের শেষে তুলসীগাছটি আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রঙ। যে দখলদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা হিন্দু বাড়িটি দখল করেছিল, মনে-মননে হিন্দু-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুতেই হিন্দু আচারের প্রতীক সেই তুলসীগাছটিকে ধ্বংস বা নির্মূল করতে পারেনি। তুলসীগাছের অম্লান উপস্থিতি মানবিকতার ধ্রুব স্থায়ীত্বেরই যেন প্রতীক:

> "এ গল্পে প্রতীকের প্রয়োগ ঘটেছে দুটি বিষয়, তুলসীগাছ ও পুরোনো আমলের দোতলা বাড়িটিকে আশ্রয় করে। শীর্ণ তুলসীগাছটি দেশ-বিভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত, বিশীর্ণ ব্যক্তিদের অস্তিত্বেরই প্রতীক। আর পুরোনো বাড়িটি দ্বিজাতিতত্ত্ব- নির্ভর এ দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকেই করেছে প্রতীকায়িত। আশ্রয়হারা, উন্মুল মানুষগুলি যে-গৃহের আশ্রয়কে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তা তাদের নির্ভরতা দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা হয়েছে আশ্রয়হারা। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে পূর্ববাংলার অধিবাসীরাও তাঁদের স্বদেশ ও স্বাদেশিক অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখেছেন যে, তাঁরা মূলত বাস্তুচ্যুত, নিজ দেশে পরবাসী।"[২০]

একটি 'তুলসীগাছের কাহিনী' সম্পর্কে আব্দুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) মোতাহের হোসেন চৌধুরী[২১] (১৯০৩-১৯৫৬)-র মতো বৃক্ষকেই জীবনের প্রতীকজ্ঞানে স্থিতধী হয়ে মন্তব্য করেছেন: 'সবক্লিন্ন রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতির উপরে যে-মানুষ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা-এই গল্পে আছে তার ভাস্বর চিত্রণ।.... 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' আসলে বৃক্ষের কাহিনী নয়-মানুষের কাহিনী।'[২২]
আর তানভীর মোকাম্মেল গল্পটির মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের আত্যন্তিক 'সমাজচেতনা' আবিষ্কার করে লিখেছেন:

> 'দেশভাগের ট্রাজেডীর ঋত্বিকীয় যন্ত্রণাময় আর্তি ছাড়া ও আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পটিতে মূর্ত, তা হচ্ছে স্বল্পবেতনভূপেটিবুর্জোয়া কেরানী কূলের চরিত্রচিত্রণে ওয়ালীউল্লাহ্র প্রশংসনীয় দক্ষতা, যাদের মধ্যে সবচেয়ে "বামপন্থী"-টির কাঁটা ও সংশয়ে দুলে দুলে অবশেষে ডান দিকেই হেলে পড়ে।'[২৩]

একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এ গল্পে কোনো প্রচারধর্মী উচ্ছ্বাস স্থান পায়নি। সাময়িক ঘটনা উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে চিরন্তন মানব-মনের বার্তাই পরিবেশিত হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়ধ্বনি। সেজন্যেই দখলদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা আজ যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিন্দা করছে, তখনই আবার যত্ন নিচ্ছে তুলসীগাছের। ফলকথা, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' এ দেশীয় সমাজের এককালীন সংকট, দেশবিভাগপীড়িত ও প্রহত অস্তিত্ব-অন্বেষার রূপকল্প, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অসাম্প্রদায়িক ও মানবপ্রেমী চৈতন্য, তাঁর সমকালকে স্পর্শ করে কালান্তরে উপনীত হওয়ার আলেখ্য, রূপবর্ণিমা।

অসাধারণ সমাজবাস্তবতার গল্প 'পাগড়ি'। কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হলেও 'দুই তীর' এর আফসারউদ্দিনের মতোই 'পাগড়ি' পৌঢ় খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের নিঃসঙ্গতাবোধ, তাঁরই জীবনকে পদে পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ-আকাঙ্ক্ষার রূপকল্প। মোত্তালেব সাহেব আইনের লোক, সারা জীবন আইনের অলিগলিতে অশান্ত কীটের মতো ঘোরাঘুরি করেছেন, পসার জমিয়েছেন, পয়সা করেছেন। মফস্বল শহরে দোতলা বাড়ি করেছেন। পাঁচ সন্তানের জনক তিনি। কিন্তু এই জীবন তাঁকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি। কারণ বিকৃতমস্তিষ্কা স্ত্রী তাকে সুখী করতে পারেনি। যার কারণে মোত্তালেব সাহেবের মনের অন্ধগলিতে

একদিন নীরবেই জন্ম নেয় একটি সংকল্প, তা হলো তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের পয়গাম। দ্বিধার সঙ্গে হলেও সন্তানদের কাছে তিনি এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাঝবয়সী পিতার এ সিদ্ধান্তে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম নিলেও তারা বাহ্যিক সংযম হারায়নি। নজু মিয়ার মাধ্যমে চলেছে বিয়ের আয়োজন। বিয়ের জন্য মোত্তালেব সাহেব নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়েছেন, বজরা ভাড়া করেছেন, নববধূর জন্য শাড়ি-গহনা কিনেছেন। কিন্তু কিনতে পারেননি 'আড়ম্বরের চুম্বকশীর্ষ' এবং 'নওজোয়ানের উদগ্র নিশানা' একটি পাগড়ি। সবার অজান্তেই মোত্তালেব সাহেব ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিয়ে সম্পন্ন করেন। 'ইট-সুরকি ঢালা রাস্তায় ঘোড়ারগাড়ি লোহার-পাতে-ঘেরা চাকা ঘড়ঘড়িয়ে মচমচিয়ে চলে।'[২৪] নববধূসহ মোত্তালেব সাহেবগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তাঁর পোশাক, শরীর, মাথার কিস্তি টুপি, নববধূর দামি শাড়ি ভিজে যায়। তবে ভিজেনি মোত্তালেব সাহেবের দামি মাসহাদি পাগড়ি।

বয়সের বাধা কিংবা ছেলেমেয়েই বিয়ের যোগ্য হয়েছে, তা মোত্তালেব সাহেব মানেননি, কারণ তিনি বাহাদুর, উকিল, জমিদার। তিনি তাঁর বৃত্তে প্রভু। সুতরাং যৌনপিপাসা মেটানোর জন্য বারবার বিয়ে করবেন। তাই সব কিছু ভিজে গেলেও পাগড়িটি ভিজে না। 'পাগড়ি' গল্পটি বাঙ্গালি মুসলমানের সামন্ত-বুর্জোয়াও পাতি বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ সমাজে যেমন শ্রেণিবিভাজন, তেমনি নরনারীর মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও:

> "এই সামন্ত-মুৎসুদ্দী সমাজে পুরুষেরই প্রতাপ; পুরুষ সেখানে প্রভু: স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী ও লোভী; নারী সেখানে বন্দিনীই শুধু নয় সে নির্যাতনের পাত্রী, সেবিকা বা ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি কিছু নয়; পুরুষের নির্যাতনে অভিশপ্ত তার জীবন: সে শাসনেরও শোষণের বস্তু মাত্র।"[২৫]

'পাগড়ি'র খান বাহাদুরএর পাগলি স্ত্রী এই সমাজের অবহেলিতা প্রতিরোধহীন নারীর প্রতীক, খান বাহাদুর লোভীও নির্বিবেক পুরুষের।

'কেরায়া' গল্পটি সংক্ষিপ্ত নৌ-যাত্রার কাহিনি। মাঝিদের কেরায়া-বঞ্চিত, ব্যর্থ প্রত্যাশাও তিক্ত অভিজ্ঞতার এক পিঙ্গল আখ্যান। কাহিনির শুরু এক সন্ধ্যায়, শেষ পরবর্তী দিবাগত রাত্রিতে। কেরায়া নৌকার দুজন দরিদ্র মাঝি গুড়ের কেরায়া নেবে বলে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মহাজন আসেনি তাই মাঝিরা শূন্য নৌকা নিয়েই ফিরে এসেছে। দারিদ্র্যের হাহাকার গল্পটিতে স্পষ্ট। কেরায়া নৌকাই মাঝিদের জীবিকা সংস্থান করে, তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা সামান্য ঐ টাকার আশাতেই দূর গাঁয়ে থাকে বুক বেঁধে: 'জোয়ান মাঝি দুটির পেটে, এতিম ছেলেটার পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলে। দূর গাঁয়ে তাদের বাড়িতেও সে- আগুন জ্বলে ধিকিধিকি করে।'[২৬] জীবনবাদী শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'কেরায়া' গল্পে জীবনের জয়গান ঘোষণা করেছেন। কারণ মৃত স্থবির, জীবন চলমান। জীবনের যে জৈবিক বিক্রিয়া তা মৃত্যুর জন্য থেমে থাকে না। তাই নৌকায় মৃতদেহ দেখেও বালকটি ঘুমায়, মাঝি এসে তার পাশে ঘুমায়: 'অন্তর্লোকে, নিজের অবিভাজ্য সত্তায় প্রতিটি মানুষই বিচ্ছিন্ন, পরমভাবে একা। তৎসত্তে ও জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলেছে।'[২৭]

'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আলো ফেলেছেন আমাদের সমাজের অন্যতম ব্যাধি হিংসা-বিদ্বেষের উপর। যার কারণে ব্যক্তি বা পরিবার তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবনকে নিষ্ফল করে তোলে। জীবন হয়ে ওঠে সুখ-শান্তি বিবর্জিত। সদরউদ্দিন ও আখলাকের বাল্য জীবনের কলহ-বিবাদ হাতাহাতি মারামারি পরবর্তী জীবনে একটি মারাত্মক হিংসা-বিদ্বেষে পরিণত হয়। বাল্যকালে সদরউদ্দিন আখলাকের শার্টটি যেভাবে ছিড়ে ফেলেছিল, সেইভাবেই তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে: 'সারাজীবন সে একটি বিষাত্মক একনিষ্ঠতার সঙ্গেই আখলাকের সুখ শান্তি- ধ্বংস করেছে।'[২৮]

বাল্যকালে আখলাক অধ্যয়নশীল, সচ্চরিত্রবান এক সুবোধ বালক ছিল। আর্থিকভাবে সচ্ছল না হলেও এই গুণাবলির কারণে সে হয়তো অর্থসম্পদ সুখ-শান্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু পারেনি সদরউদ্দিনের জন্য। সদরউদ্দিনের চক্রান্তে আখলাক দীর্ঘ মকদ্দমায় লিপ্ত হয় এবং সর্বস্বান্ত হয়:

> 'সদরউদ্দিন তার বুকে যে সর্বনাশী আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়, সে-আগুনে সে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়। আজ সে ভগ্ন-দুস্থ মানুষ। মুখের বাঁ দিকে তার পক্ষাঘাত; চোখে পরাজয়ের নিবিড় গ্লানি। সে আজ যে-ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, সে-ধ্বংসস্তুপের সৃষ্টিকর্তা সদরউদ্দিনই।'[২৯]

জীবনের অন্তিম সময়ে এসে সদরউদ্দিনের যে আত্মশোচনা-আত্মগ্লানি তা আমাদের সমাজের বিবেকবান মানুষের প্রতীক। 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'য় সদরউদ্দিনের কূটঅভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে আখলাকের জীবন হয়েছে বিপৎসঙ্কুল, দুঃখময়ও দারিদ্র্যকীর্ণ। তাই সদরউদ্দিন তার কৃতকর্মের জন্য আখলাকের কাছে মাপ চাওয়ার সংকল্প করে। কিন্তু যখনআখলাকের সঙ্গে তার দেখা হল, তখন অশ্রুপ্লুত আখলাককে দেখে সদরউদ্দিনের সমস্তই বিস্মৃত হল,মাফ চাওয়ার কথাই ভুলে যায়,বুঝে উঠতে পারে না তার এ বিচিত্র শেষ যাত্রাটিরই-বা অর্থ কী: 'এই নির্বাক নিরর্থক তাতেই তার জীবন শেষ হয়। হয়তো আমাদের সবারই জীবন।'[৩০]

ওয়ালীউল্লাহ্ সুযোগ পেলেই মধ্যযুগীয় রীতিনীতির প্রতিভূ এদেশের তথাকথিত বনেদী সম্প্রদায়কে যেমন শ্লেষও বিদ্রূপে বিদ্ধ করতেন, তেমনি মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার পূজারী এ-দেশের একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করতেও তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁর 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সামাজিক কুসংস্কারের উপর এক নীরব প্রতিবাদ। গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ আবিষ্কার করেছেন মানব-অস্তিত্বের ভিন্নতর স্বরূপ। ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে লিপিডো চেতনা সুপ্ত থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে সেই আদিম প্রবৃত্তি কদর্যরূপে প্রকাশ পায় আম-মৌলবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে:

> "তারপর সহসা যেন মস্তিষ্কশূন্য হয়ে সে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সেলিনার সামনে উবু হয়ে বসে তার গালের ক্ষত স্থানে মুখ দিয়ে সে চুষতে থাকে ক্ষত স্থানটি। তার গালে আম-মৌলবীর কর্কশ ঠোটের স্পর্শ পেয়ে সেলিনা হঠাৎ নিথর হয়ে পড়ে। মনে হয় তার সমস্ত শরীর জমে পাথর হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে সে কঠিন দৃষ্টিতে আম-মৌলবীর দিকে তাকিয়ে কঠিনতর কণ্ঠে বলে, আপনি আমার গা ধরেছেন। দাদাসাহেবকে বলে দেব।"[৩১]

ক্ষত স্থানে মুখ দিতেই সেলিনার আত্মজাগরণ ঘটেছে এবং সে ফিরে পেয়েছে তার জাগরণ সত্তা, নারী ব্যক্তিত্ব ও সচেতনতা। গল্পটিতে একসঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্ব ও গেঁয়ো মোল্লাদের শঠতার এক নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র অঙ্কিত। আম-মৌলবীরা মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজ জীবনকে অসুস্থ করে তোলে, আবার তারাই দায়িত্ব নিতে চায় স্ব-সৃষ্ট রূগণ সমাজকে সুস্থ করে তোলার, যার পরিণতিতে সমাজ আরো বেশি অসুস্থ এবং অনারোগ্য হয়ে পড়ে। গল্পটিতে এই সামাজিক দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, সরাসরি নয়-পরোক্ষে; সংস্কারের মতো নয়-শিল্পীর মতোই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আম-মৌলবীর হাস্যকর, বিরক্তিকর, উপহাস্পদ চেহারাস্পষ্ট করেছেন 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে। আম- মৌলবীর কূটকৌশলে দাদাসাহেবসহ বাড়ির সকলে বিভ্রান্ত হয়েছে। তার মিথ্যা ফতোয়ার জন্যেই বাড়ির লোকেরা ভূতের চোখ এড়ানোর জন্যে সেলিনার মাথার সুন্দর চুলগুলো কর্তন করেছে। জীনাত ইমতিয়াজ আলী এ সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বলেন:

> "আমাদের ধর্মশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ণ, একদেশদর্শী হওয়ায় ধর্মবেত্তা বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে চারিত্রিক অসংগতি, প্রবল মানস-বিকারও বৈকল্যের উপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট। 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সেলিনার কথামালা ও আম মৌলবীর আচরণের মাধ্যমে গল্পকারের সেই মানব মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানী ও অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত সমাজে ব্যক্তি-মননের স্বরূপ-সচেতন অন্তরের প্রকাশ ঘটেছে।"[৩২]

প্রখর সমাজচেতনা বিচ্ছুরিত গল্প 'মালেকা'। গল্পটিতে দারিদ্রজজ্জরিত নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, দীনতা চমৎকার নৈপুণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র মালেকা অনাহারে ও অচিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বিশযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ঠিক পূর্বমুহূর্তের শিক্ষক সমাজের দৈন্যদশা মালেকা গল্পের উপজীব্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মাস্টার শ্রেণির প্রতি অসম্ভব ভালোবাসায় সিক্ত গল্পটি:

> "মাস্টরনিরাও মানুষ। তারা কলযন্ত্র নয়। তাদেরও পরিবার আছে; তাদেরও সমস্যা আছে। চালের দরটার কথা ভেবে দেখ। চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যেই ওঠা-নাবা করে। নাবলে কাকর বাড়ে অথবা ভেঙ্গে ক্ষুদ্র হয়। উঠলে ঘরে এক মুঠো আসে কি আসে না। মানুষের পেটে দানা নেই, 'কুত্রাপি শব্দের অর্থ জেনে কী হবে?"[৩৩]

স্বামী, শাশুড়ি আর দুটি ছেলে-মেয়ের জন্য মালেকা জীবনযুদ্ধে নামে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকতা সূত্রে পাওয়া অর্থ সামান্যই। মালেকার গার্হস্থ্য জীবন তাই দারিদ্রতায় পরিপূর্ণ, হিসাব-শাসিত, অভাবক্লিষ্ট ও অপ্রাপ্তির বেদনায় দীর্ঘায়িত। 'মালেকা' সেদিক থেকে তারই সংগ্রামী সত্তা; এবং জীবনযুদ্ধের করুণ অথচ বাস্তবানুগ কাহিনি। মালেকা জীবনযুদ্ধে পরাজিত এবং অস্তিত্বের সংকটে বিধ্বস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি।

মূল্যায়ন:

ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা ভাষায় শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অনুপুঙ্খ জটিলতা যেমন পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে তেমনি বাংলার সমাজজীবনের বাস্তবতাও পুরোপুরি উপস্থিত, তবে তা প্রতিবেদনের মতো নয়। আধুনিক শিল্পে যেমনটি থাকা বাঞ্চনীয় তেমনই সূক্ষ্মভাবে। ওয়ালীউল্লাহ্ তিরিশের লেখকদের মতো ঘোষণা দিয়ে বস্তিতে, নর্দমায়, অবজ্ঞাত, পরিত্যক্তদের এলাকায় যাননি সেখানকার মানুষের জীবন আঁকতে, তবে তাঁর লেখায় বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা বিম্বিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলোয় পাওয়া যায় নদীতীরবর্তী জনপদ, মাঝিমাল্লার সংগ্রামী জীবন, নৌকায় খরতালের ঝনঝন্ শব্দ, খাল বিল পুকুর ডোবার সোঁদা গন্ধ, গাঁয়ের মেয়েদের ঘন কালো চুল, অন্তেবাসী মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা প্রেম ভালবাসা রিরংসা দীনতা মহত্ত্ব, তাদের জন্ম-মৃত্যুর কথা এবং স্বপ্ন ও সংগ্রাম, যুদ্ধের বাজারে আধপেটা-থাকা বিপন্ন মানুষ, দুর্ভিক্ষের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুযাত্রা, উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্তের নিষ্প্রাণ জীবন, মুসলমান পরিবারের নারীর অবরুদ্ধ জীবন, পতিপরায়না নারীর বৈচিত্রহীন একঘেয়ে জীবন, মুসলমান সমাজের বহু-বিবাহ, পরিপূর্ণ যৌবনা অশ্রুমতী নারী, সতীনের সঙ্গে সতীনের ব্যতিক্রমী সম্পর্ক, উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের হাহাকার, বনেদী মুসলমানদের আত্মঘাতী অহংকার, দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রীর তুলসীতলায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মফস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা, দরিদ্র ইস্কুল-শিক্ষয়িত্রীদের জীবন সংগ্রামের করুণ কাহিনি, ধর্মব্যবসায়ী কাঠমোল্লা ও আম-মৌলবীদের ভণ্ডামী, দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সারেং খালাসীর সামুদ্রিক ও বন্দরের জীবন, মুসলমান গাড়োয়ান, ঘোড়া আর আস্তাবলের চিত্র, সর্বোপরি ব্যক্তির অন্তর্জীবনের জটিলতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। তা ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই পূরণ করেছেন সেই অভাব যা দীর্ঘদিন যাবৎ উপলব্ধি করেছেন এ ভাষার পাঠকগণ: তিনি

উপহার দিয়েছেন মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতরকার চিত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন গল্প লেখা শুরু করেন তখন বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণকাল: প্রধান গদ্যশিল্পীগণ শুধু জীবিত নন প্রবলভাবে সৃষ্টিশীল। মাত্র পঞ্চাশ-বাহান্নটি গল্পই ওয়ালীউল্লাহকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছে। জীবন রূপায়ণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্র, জীবন-বিন্যাসের প্রকরণেও তিনি বিশ্বমুখী। চরিত্রে, কাহিনি নির্মাণে, জীবন ও সমাজ-ভাবনায় তাঁর ছোটোগল্পগুলো একেবারেই অন্য কারো মত নয়।

তথ্যসূত্র:

১. শ' রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাস: যুগ-পরিবেশ ও সামাজিক পটভূমি(প্রথম খণ্ড), কলকাতা: ১৯৮২, পৃ. ৬৪
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, কলকাতা: ১৯৮২, পৃ. ৪৮৪
৩. ইমতিয়া, আলী জীনাত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, ২০১৫,পৃ. ৫২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৫. হামি, শামীমা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যকর্ম শব্দ ব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহ রীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০
৬. সৈয়, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯
৭. মকসু, সৈয়দ আবুল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের: জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৬৬
৮. সৈয়, ওয়ালীউল্লাহ্, গল্পসমগ্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১
৯. সৈয়, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১০. সৈয়দ,ওয়ালীউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১১. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১২. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১৪. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২
১৫. হামিদ, শামীমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৬. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
১৭. ইসলাম, আজহার, বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩২
১৮. মকসুদ, সৈয়দ আবুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
১৯. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২০. বোস, চঞ্চল কুমার, বাংলাদেশের ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৯
২১. চৌধুরী, মোতাহের হোসেন, সংস্কৃতি-কথা, ঢাকা, ১৩৬৫, পৃ. ১৩৫-১৩৭
২২. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৪
২৩. মোকাম্মেল, তানভীর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৭, পৃ.২৩
২৪. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
২৫. সৈয়দ, আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

২৬. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৭. জীনাত, ইমতিয়াজ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩
২৮. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৩০. মান্নান, সৈয়দ আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮
৩১. ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪
৩২. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭
৩৩. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮